পঞ্চম অধ্যায়

সমকালীন ছোটগল্পকার ও আশাপূর্ণা দেবীর স্বাতন্ত্র্য

পঞ্চম অধ্যায়

সমকালীন ছোটগল্পকার ও আশাপূর্ণা দেবীর স্বাতন্ত্র্য

আশাপূর্ণা দেবীর দীর্ঘকালের সাহিত্যিক জীবনে তাঁর সমকালীন লেখকবৃন্দ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন — সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু, বিমল কর, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ। এঁরা সকলেই প্রায় একই সময়ে খ্যাতির মধ্য গগনে বিরাজ করেছিলেন। কল্লোল যুগের পরে পঞ্চাশের দশকের প্রথমাবধি ছোটগল্পের বলিষ্ঠ পদচারণা থাকলেও ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হয়ে আসে। প্রবীণ লেখকেরা যেন এই পর্বে এসে এক মানসিক প্রশান্তি অনুভব করেছেন। লেখনীর ক্ষুরধার কমে গিয়ে আধ্যাত্মিক বাতাবরণে যেন আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তখনই নতুন পথ জিজ্ঞাসা নিয়ে, নানা দিকের মনোবীক্ষণ নিয়ে আবির্ভূত হলেন কিছু লেখক-লেখিকাবৃন্দ। পত্র-পত্রিকার সংখ্যাধিক্যে অনেক সাহিত্যিকের লেখনী সম্প্রসারিত হবার সুযোগ পেল। স্বাধীনতার পূর্বে সমাজ ও জীবনের নানা সমস্যার জন্য দায়ী ছিল ইংরেজ সরকার কিন্তু স্বাধীনতার পরে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পরেও যখন সমস্যা টিকে রইল তখনই মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিচিত্র প্রবৃত্তি সমাজ জীবনে নানাভাবে প্রতিফলিত হতে শুরু করল। জীবনযাত্রার জন্য ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাগুলোর অভাব পূরণের জন্য সংগ্রাম শুরু হওয়ায় সৃষ্টির উন্মাদনা যেন মানুষের অন্তর থেকে অপসৃত হয়ে গেল। এই রকম পরিস্থিতিতে উপরোক্ত লেখকদের আবির্ভাব ঘটল। সমাজের নানা সমস্যাগুলো এবং তার সঙ্গে মানুষের চিত্তলোকের নানা দিকগুলোও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে লাগল।

সমাজ সংসার যখন প্রচণ্ড অস্থিরতা ও যান্ত্রিক অগ্রগতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে তখনই আবির্ভাব ঘটে বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও ক্ষুরধার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এক বলিষ্ঠ লেখকের। তিনি হলেন **'সুবোধ ঘোষ'** (১৯০৯-১৯৮০)। সার্কাসের আসর, ছোটনাগপুরের বন, ওয়াজিরিস্তানের পথ পরিক্রমা, সাংবাদিকতা, প্রাইভেট টিউশনি প্রভৃতি কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বহুল স্থান পরিদর্শনের সুযোগ তাঁর জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। একথা তিনি নিজমুখেই বিবৃত করেছেন — "লেখক হবার আগে জীবনের আলো ছায়া ও অন্ধকারের অনেক রূপ ও অনেক ঘটনা দেখার অভিজ্ঞতা আমারও ছিল। শ্মশানের ভয়ানক ধোঁয়ার কুজ্ঝটিকা ও শালবনের মাথার উপর পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্না বিস্তার, দুইই দেখবার অভিজ্ঞতা।" ... *('সেদিনের আলোছায়া' — সুনির্বাচিত; বাংলায়*

গল্প ও ছোটগল্প, ড: সরোজ মোহন মিত্র, পৃ. ২৪২)। লেখক মাত্রেই শিল্পী, আর শিল্পীরা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির জগতের সার্থক উত্তরাধিকারী। সমাজের শ্রেণি দ্বন্দ্ব, মধ্যবিত্ত সমাজের অভ্যন্তরস্থ সংকটাপন্ন অবস্থা, শ্রমিক শ্রেণির শোষণের যন্ত্রণাকে সুবোধ ঘোষ সুন্দর ও সার্থকভাবে গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত কিছু গল্পগ্রন্থ — 'ফসিল' (১৯৪০), 'গ্রামযমুনা' (১৯৪৪), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৯৫৭), 'নিতসিন্দুর' (১৯৫৮), 'জতুগৃহ' (১৯৬২), 'নিকষিত হেম' (১৯৬৩), 'রূপনগর' (১৯৬৪) ইত্যাদি। সুবোধ ঘোষের বাংলা গল্প সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রথম পদক্ষেপ হল 'অযান্ত্রিক' (১৯৪০) গল্পের মাধ্যমে।

সুবোধ ঘোষ তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে অভিনবত্বের দাবী করতে পারেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বাঙালীর সমাজ ও জীবনের মূল্যবোধ, বিশ্বাস — সমস্তই তার দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে; আর এখান থেকেই স্বতন্ত্র এক ধারা বের করে নিয়ে গল্পে নতুনত্বের স্রোত প্রবাহিত করে দেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষ। ১৯৪০ সালে 'অযান্ত্রিক' ও 'ফসিল' গল্প এই ধারার মাধ্যমেই তাঁকে স্বতন্ত্রতা এনে দিল। অযান্ত্রিকের নায়ক একজন ট্যাক্সি চালক। বহুদিনের পুরাতন, জীর্ণ এক মোটর গাড়িকেই প্রাণপ্রিয়াতুল্য করে ভালোবাসা — মানুষ ও যানবাহনের এই কোমল সম্পর্ক অভিনব এক বাতাবরণের সৃষ্টি করল। পুরানো এই গাড়ি সম্পর্কে যাত্রী বা অন্য কারো অবহেলা, কটূক্তি, কখনোই বরদাস্ত করতে পারত না অথচ একদিন ক্ষমাহীন এক প্রচণ্ড বিরাগ থেকে প্রিয় এই যানটিকে ওজন দরে লোহার ব্যবসায়ীর কাছে সে বিক্রি করে দিয়েছে। অদ্ভুত রসের এক গল্প লেখক পাঠকবর্গকে উপহার দেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রতিভা সার্থকরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে দ্বিতীয় গল্প 'ফসিল' এর মধ্য দিয়ে। শোষণতান্ত্রিক সামন্তপ্রথা ও ধনতন্ত্রের মূলমন্ত্র যে অমানবিক নিষ্পেষণ — এদের যৌথ নির্যাতনে পীড়িত শ্রমিক শ্রেণির মানুষের জীবনের এক বাস্তব দলিল হয়ে উঠেছে এই 'ফসিল' গল্পটি। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের যে বিরোধ দেখা দেয় এই গল্পে — তাতে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির অভ্যন্তরীণ চিত্র নগ্নরূপে যেন প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ হচ্ছে বাংলাদেশের নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়ের মহারাজা। আর ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি হচ্ছে মাইনিং সিন্ডিকেটের সাহেবরা। ওপর স্তরে এদের বিরোধ থাকলেও অভ্যন্তরে এরাই গোপনে চক্রান্ত করে সংগ্রামী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। যে সমস্ত কুর্মী প্রজারা দিনের পর দিন অনাহারে-অর্দ্ধাহারে, শোষণ-পীড়ন মাথা পেতে সহ্য করে যেত, তারাই আজ লোভে পড়ে কুলিতে রূপান্তরিত হল। কিন্তু তাদের নেতা দুলাল মাহাতো যখনই আবির্ভূত হল এবং শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া নিয়ে আওয়াজ তুলল তখনই সরগরম হল খনি অঞ্চল। অঞ্জনগড়ের কৃষিক্ষেত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়া মরুভূমিতে যে মুখার্জী সাহেব এসে শিল্পের ও অগ্রগতির জোয়ার বইয়ে দিলেন, তারই বুদ্ধিতে আবার শিল্পকে রক্ষা করার জন্য দুলাল মাহাতোকে বন্দী করা হল। এই আনন্দে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের ঘটল মিলন এবং

এই গোপন সন্ধিকে রঞ্জিত করতে রক্ত দিতে হল সেই দুলাল মাহাতোকেই; যদিও সেটাও গোপনেই। সংঘাতের ফলে ফৌজদারের গুলিতে মারা গেল অনেক কুর্মী কুলি। তাদের দেহগুলো সব ক্ষুধার্ত খনির গহ্বরে প্রবিষ্ট হয়ে গেল, যা নাকি ভবিষ্যতে শুধু 'ফসিল' হয়ে ধরা পড়বে প্রত্নতাত্ত্বিকদের হাতে কিন্তু সেখানে থাকবে না আজকের কোন রক্তের দাগ। গল্পটি প্রকৃতপক্ষে লেখকের সাম্যবাদী আদর্শের উজ্জ্বল নিদর্শন। এই নামের মধ্য দিয়ে লেখক মানব সভ্যতায় এক কলঙ্কিত ইতিহাসকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু গল্পটির সমাপ্তিতে রয়েছে অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য। আর ভূতত্ত্বের সম্পর্কে প্রায় স্বচ্ছ একটা ধারণা।

আমাদের সমাজে দোলাচলতাময় চিত্ত নিয়ে বসবাস করে থাকে মধ্যবিত্ত সমাজ। এই গোষ্ঠিভুক্ত মানুষেরা দোষে-গুণে-হিংসা-ঈর্ষা, জিঘাংসা, আত্মপ্রতারণা ও ভণ্ডামিতে পরিপূর্ণ। তারা প্রয়োজনে সুবিধে মত দল বদল, মত বদল, অন্যায়ের হাতে ধরে চলাতেও সায় দিয়ে থাকেন। কিন্তু সুবোধ ঘোষ এই দ্বিধাদীর্ণ মধ্যবিত্ত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষগুলোকে তার লেখনীর আঘাতে বিদীর্ণ করে ফেলেন। 'ফসিল' ছাড়াও 'সুন্দরম', 'গোত্রান্তর' ও 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

মধ্যবিত্ত চিত্তের দৃঢ়তাহীন মনোভাব ধরা পড়েছে 'গোত্রান্তর' গল্পেও। সঞ্জয় এম. এ. পাশ করে চার বছরের নিদারুণ বেকারত্বের জ্বালার অবসান ঘটাল এক সুগার মিলে ত্রিশ টাকা বেতনের ক্যাশ মুন্সীর চাকরি গ্রহণ করে। কিন্তু 'ডি-ক্লাসড' লোকেদের নিয়ে কাজ করতে করতে সে নিজেও সেই শ্রেণিভুক্ত বলে ভাবতে চাইল নিজেকে। এছাড়াও রয়েছে ভর্তৃহীনা নারীদের মনোগত বেদনার কথা নিয়ে 'পরশুরামের কুঠার' ও 'বারবধূ' গল্পগুলো। 'তিন অধ্যায়' গল্পটিও সমাজ সচেতনতার ক্ষেত্রে সার্থক নাম। 'কালাগুরু' আর 'শিবালয়' — গল্পদুটোতে তিনি সার্থক করে তুলেছেন আগস্ট আন্দোলনের মতো মহৎ সংগ্রামকে। আবার আকালের দিনে ভয়ানক লাঞ্ছনা, বঞ্চনার শিকার হয়ে অন্ন বস্ত্রের নিদারুণ সংকটের মধ্যে দিনাতিপাত করার কাহিনিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে 'তমসাবৃতা' গল্পটি। 'তিন অধ্যায়', 'স্বর্গ হতে বিদায়', 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', 'স্বমহিমচ্ছায়া', 'হৃদ্‌ঘনশ্যাম', 'গ্লানিহর', 'স্নানযাত্রা', 'কৌন্তেয়' প্রভৃতি গল্পেও মধ্যবিত্তের চিত্তমুকুরে যে আত্মপ্রতারণার চিত্র কিভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে তা সুস্পষ্টরূপে প্রতীকায়িত। আবার প্রেমের গল্পের মধ্যেও তিনি চরিত্রদের অন্তরের অলিন্দে অলিন্দে নিঃশব্দ পদচারণা করে অনেক অর্ধ কুসুমিত বা কুসুমিত গোলাপ, বুনোফুল আহরণ করে এনেছেন। যেমন 'জতুগৃহ' প্রেমের গল্প হলেও শতদল ও মাধুরীর সুমধুর দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। দীর্ঘকাল পর রাজপুরের রেলজংশনের ওয়েটিং রুমে দেখা হলেও নিরুত্তাপ প্রেমই তাদের মধ্যে বজায় থাকে শুধু। 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পে তিনি দেখিয়েছেন স্বাধীন ভারতবর্ষে সমান অধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে আজও যে আদিবাসীরা

সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারে না সেই অপমানিত জীবনের চিত্রায়ণ।

সমাজের নানাদিকের নানা ক্ষতই সাংবাদিক সুবোধ ঘোষের গোচরীভূত হত। পরে তাকে নিজের অনুভূতির দ্বারা বিচিত্রভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং সেগুলো অবলম্বন করে গল্পে রূপায়িত করেছেন। তাঁর রচনায় নায়কের ভূমিকায় তাই রয়েছে মোটরগাড়ি চালক, আদিবাসী খ্রীষ্টান কিশোর, বাহ্যিক আদর্শের আবেষ্টনে আবৃত প্রতারক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবক, ফাঁসির আসামী ও সমাজসেবক যে অন্যের সন্তান গর্ভে ধারণ করা সত্ত্বেও প্রিয়ার আসন অটুট থাকে (শুক্লাভিসার), আবার মধ্যবিত্ত নারী লোভীদের চিত্রও রয়েছে।

মধ্যবিত্ত দুর্বল চিত্তের গল্প আরো রয়েছে 'নির্বন্ধ' গল্পে বিভূতি দারোগা ও 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ' গল্পে কান্তিকুমারের মধ্যেও। সুবোধ ঘোষের তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বস্তুকে সমাজের আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী নিজেও চারদেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতেন, বিষয়বস্তুকেও সেই সংসার আবর্ত থেকেই তুলে আনতেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (জন্মঃ ১৯১২, মৃত্যুঃ ১৯৮২) বাংলা সাহিত্যের জগতে এক নিপুণ শিল্পী। তিনি যে সময়ে গল্প রচনা করেন সেই চল্লিশের দশকে আমাদের সমাজে নানা ঘটনার ঘনঘটা, টানাপোড়েন দেখা গিয়েছিল এবং স্বভাবতই সেসব লেখক শিল্পীমনকেও স্পর্শ করেছে। তার প্রমাণ আমরা পূর্বোক্ত লেখকদের মধ্যে দেখতে পাই। কিন্তু রাজনীতি প্রভাবিত সমাজ, শোষিত কলুষিত সমাজ সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন একেবারে উদাসীন। তিনি ছিলেন আত্মসচেতন, মনন ঋদ্ধ এক জীবনশিল্পী। বহির্জগতের নানাবিধ সমস্যা ও কার্যাবলী সাধারণতঃ সাহিত্যিকদের চিন্তা-চেতনাকে আলোড়িত করে থাকে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উত্তরণ ঘটে বাস্তব জগতের এ সমস্ত বোধকে ছাড়িয়ে অন্তর্গহনে। তিনি অন্তর্লোকে নিবিষ্টচিত্ত হয়েই মানুষের জীবনের জটিল দিককে শিল্পে রূপায়িত করেছেন। তাঁর গল্পে সাধারণতঃ প্লট বলে কিছু থাকত না এবং গল্পের বক্তব্যও অনেকটাই গৌণ ছিল। কিন্তু তিনি বাস্তবজগত থেকেই গল্পের চরিত্রদের সংগ্রহ করতেন এবং নিজের নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টির আলোয় তাদের আলোকিত করে উপস্থাপিত করতেন। তাঁর অন্তর্লোকের জীবনদৃষ্টি ছিল প্রকৃতি প্রেম।

প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার প্রগাঢ়তা জ্যোতিরিন্দ্রর নন্দীর বাল্যকাল থেকেই দেখা গিয়েছিল। প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে বিমুগ্ধচিত্তে তাদের রূপসুধা পান করতেন। কৈশোরকালে পুকুরঘাটে সৌন্দর্য, আকাশের নির্মল বিশালতা গাছপালা পাখীর অপার সৌন্দর্য, প্রাণভরে উপভোগ করতেন। অন্য শিশুরা যখন খেলে বেড়াচ্ছে হৈ চৈ করে, তিনি তখন নিঃশব্দে প্রকৃতির সঙ্গে অন্তর্মগ্ন হয়ে যেতেন। তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় জন্মান। যেখানে নদী-নালা-খাল-বিল প্রচুর রয়েছে। তিতাস নদীর বুকে যখন ভাদ্র মাসের নৌকা দৌড় প্রতিযোগিতা হত, যখন দেবী দুর্গার ভাসান হত আশ্বিন মাসে

— তখন অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে এলেও তিনি কিন্তু আনন্দ হুল্লোড় থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কার্যকলাপের যে মেলবন্ধন ঘটছে এবং তা থেকে যে অপরূপ রূপরাশি ফুটে উঠেছে তার অনুভবে আত্মমগ্ন হয়ে যেতেন। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতায় তাঁকে সাহায্য করত এই অতিমাত্রায় ঘ্রাণ সচেতনতা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী লেখার জন্য অনেক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন — নবশক্তি, দেশ, যুগান্তর, আনন্দবাজার, পরিচয়, পূর্বাশা, চতুরঙ্গ প্রভৃতি, এমনকি বাংলাদেশের ঢাকা থেকে প্রকাশিত সোনার বাংলা ও বাংলাবাণী পত্রিকায় তাঁর ছোটগল্পগুলো প্রকাশিত হত। তাঁর রচিত গল্পগুলো হল — 'গিরগিটি', 'নদী ও নারী', 'চোর', 'সমুদ্র', 'বনের রাজা', 'সোনার চাঁদ', 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা', 'আলোর পাখি', 'শালি কি চড়ুই', 'বুটকি-ছুটকি', 'তারিণীর বাড়িবদল', 'ট্যাক্সিওয়ালা', 'মাছের দাম', 'ঘরণী', 'পালিশ', 'চশমখোর' প্রভৃতি।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর প্রকৃতি প্রেমকে সৌন্দর্যবাদের মধ্য দিয়ে বিকশিত করে তুলেছেন। আর এই সৌন্দর্য চেতনার মধ্য দিয়ে অন্তর্লোকের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। এর নিদর্শন পাওয়া যায় চোর, গিরগিটি, নদী ও নারী, সমুদ্র প্রভৃতি গল্পে। 'চোর' গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত এবং কথক হচ্ছে মিন্টু নামের একটি কিশোর। মিন্টু একটি বাচ্চা চাকর মদন ও একটি পেঁপে গাছ— এরাই হচ্ছে মুখ্য চরিত্র। প্রকৃতির দর্পণে নিজেকেও যেন মিন্টু দেখতে পায় আর এভাবেই অন্তর্লোকের জটিলতা উন্মোচিত হয়ে পড়ে ও মিন্টুকে তার আত্মমর্যাদাবোধে উপনীত করে। মিন্টু আর কোনদিনও সুকুমারের বাড়ি যায়নি।

সৌন্দর্য পিয়াসী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী লিখেছেন 'নদী ও নারী' গল্পটি। প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখে তিনি নারীর রূপ বর্ণনা করতেন। কুয়োতলার নির্জনতায় মায়ার স্নানের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য প্রকৃতি যেন গাছপালা, পোকা-মাকড়, পাখীদের নিয়ে সদলবলে উপস্থিত হয় সেখানে। প্রকৃতির সৌন্দর্য চেতনা ও জীবনবোধ মিলেমিশে একীভূত হয়ে যায় এখানে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রকৃতির সঙ্গে নারীর রূপকে মিলিয়ে নিয়ে সৌন্দর্য চেতনায় উচ্ছলিত পাত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর তাই প্রকৃতিও যেমন লালসার শিকার নয়, তাঁর গল্পে নারীরাও ভোগের সামগ্রী নয়। এই চেতনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় 'গিরগিটি' গল্পে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই প্রকৃতি মণ্ডিত প্রেমের স্নিগ্ধ মধুর রূপ বর্ণনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে করিয়ে দিলেও একটা জায়গায় তাদের পার্থক্য থেকেই যায়। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি তন্ময়তায় উদার বিস্তৃত পল্লী প্রকৃতির দিগন্তজোড়া ব্যাপ্তি ছিল, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ক্ষেত্রে তা ছিল না। সেখানে বিশালতা নিয়ে পল্লী প্রকৃতি আসে নি, আধুনিক শহরের উপকণ্ঠে অনাভিজাত জনজীবনের সান্নিধ্যে যে ঝোপ-ঝাড়, কুয়োতলা, পুকুরঘাট, বাড়িতে তৈরি বা গজিয়ে ওঠা কিছু গাছপালা, পোকা-মাকড়

— তাদের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আর এগুলোতেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর দ্রষ্টা চক্ষুর তন্ময়তা জীবন্ত হয়ে উঠত।

'সমুদ্র' গল্পও প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েই শেষ হয়েছে। কাহিনি প্রায় নেই বললেই চলে, মামা নামে ব্যক্তিটির মধ্য দিয়ে একটা নিষ্ঠুর ভয়ংকরতার ছবি ফুটে উঠেছে। একসময় সে তার পত্নীকে সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলেছিল। কিন্তু কোথায়, কখন এবং কীভাবে তা জানা যায় না; কিন্তু মামার বৈশিষ্ট্য বর্ণনাতে যে একটা কৌতূহলের উদ্রেক করা হয়েছে তার আকর্ষণেই গল্পে পাঠকের আকর্ষণ বজায় থাকে। গল্পে বরং প্রাধান্য পেয়েছে সমুদ্রের অজস্র রূপের বর্ণনা। এই সৌনদর্য চেতনার মধ্য দিয়ে যে অনুভবের গভীরতায় পৌঁছে যেতেন সেখানেই তিনি অন্তদর্শনের এক অপরিমেয় শান্তি লাভ করতেন। আর এই বোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে পাতার পর পাতা লিখে যেতেন। অথচ সেখানে প্লট বলে কিছু নেই।

ঘ্রাণশক্তির সচেতনতা তাঁর রচনায় যে প্রভাব বিস্তার করত তার ফলস্বরূপ পাই 'বনের রাজা' গল্পটি। এই গল্পের বর্ণনায় কাহিনিতে ও চরিত্রে মিশে আছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার গল্প। ঠাকুরদার গায়ে তিনি পেতেন পাকা আমের গন্ধের মতো ঘনমদির কোন গন্ধ। যা তাকে ঠাকুরদার দীর্ঘায়ু লাভের ইচ্ছাকে লোলুপতা বলে মনে করাত। সেই অনুভূতি থেকে লিখলেন 'বুটকি-ছুটকি' গল্পটি। গিরগিটি গল্পেও এই ঘ্রাণচেতনা কাজ করেছে যুবতী বৌটির বর্ণনায়। হালুইকরের কড়াই থেকে উঠে আসা লুচি-মিষ্টি ভাজার ঘিয়ের গন্ধ। আবার প্রকৃতির বর্ণনায় উঠে আসে হাঁসের গায়ের গন্ধ এবং মাটির উঠোনের সোঁদা গন্ধ। গ্রামবাংলার মাঠে-ঘাটের গন্ধ নানারূপে উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। যেমন — খাল-বিলে পাট পচানোর গন্ধ, বর্ষায় মাছের আঁশটে গন্ধ, ধানের গন্ধ, মুলো শাক সবজির গন্ধ, মাটির গন্ধ, ঘাস ফুল পাখির গন্ধকে তিনি আলাদা আলাদা করে যেন চিনে রাখতেন।

সামাজিক অবক্ষয়ের কথা তাঁর গল্পে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ না পেলেও বিচ্ছিন্নভাবে ধরা দিয়েছে নানাবিধ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ট্যাক্সিওয়ালা, চশমখোর, মাছের দাম, পালিশ প্রভৃতি গল্পগুলো এই প্রকৃতিতে রচিত।

সমসাময়িক লেখকদের রচনারাজিতে যে সমাজ সচেতন জীবনবোধ, জীবনযন্ত্রণা, বাস্তবতার কোমল কঠোর রূপ নিয়ে চিত্রায়িত হয়েছে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রচনায় তার দর্শন মেলে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনি আত্মগতভাবে একাকীত্বের নির্জন বলয়ের মধ্যেই আবর্তিত হতেন, ফলে সামগ্রিক কালচেতনা বা জীবন জটিলতা তাকে স্পর্শ করে গেলেও ভাবিত করত না। তাই সমস্ত অভিজ্ঞতা অনুভূতিকে তিনি অন্তর্মুখী করেই প্রকাশ করতেন। এর ফলেই তিনি পাঠকদের উদাসীনতার জগতেই রয়ে গেছেন। কলরব মুখরিত জীবনযাত্রায় তাঁর সৌন্দর্য চেতনার একক সঙ্গীত কোন মূর্চ্ছনার সৃষ্টি

করতে পারে নি, ফলে সাফল্যের শীর্ষে হয়ত অবস্থান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু ভাষা-শৈলী-প্রকরণগত দিক; রীতির স্বতন্ত্রতা — সব মিলিয়ে যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করে তার ফলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একজন অনবদ্য অভিনব শিল্পী হিসেবে বাংলা ছোটগল্পের জগতে স্থান করে নিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এসব বৈশিষ্ট্যের গুণেই তাঁর একটা স্বতন্ত্র জগত তৈরি হয়েছে, আবার আশাপূর্ণা দেবী কল্লোলিত জীবনযাত্রা ও সমাজের মধ্যেই আত্মস্থ হতেন বলে সামাজিক জীবন ও চরিত্রই তাঁকে পরিচিতি ও খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬ জন্ম — মৃত্যু ১৩-৯-১৯৭৫)। ১৯৪৬ সালের উত্তাল ভারতে কোন একদিনে তাঁর প্রথম গল্প সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল। যে সময়ে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে, সমাজের বুকে দেখা দিয়েছে অন্নবস্ত্রের অভাব, কালোবাজারি, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ — এককথায় সামাজিক অস্থিরতা। ভারতের বুকে এত বিদ্রোহ — যা নাকি সামরিক বাহিনীকেও কম্পিত করে তুলেছে আর তার প্রভাবে মানুষও হয়ে উঠেছে বিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক। এমতাবস্থায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তিনি শান্তরসে দীক্ষিত ছিলেন তাই মানুষে-মানুষে যে হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানিতে মত্ত হত সেটা ছিল তাঁর ভীষণভাবে অপছন্দের। মানুষের চলার পথে স্খলন, পতন ও পাপকার্যের চেয়ে শান্ত ও মধুর দিকটিই ছিল নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের উপাদান। তাঁর প্রথম গল্প হল 'মৃত্যু ও জীবন' (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত কিছু গল্প সংকলন হল — 'অসমতল' (১৩৫২), 'হলদেবাড়ি' (১৩৫২), 'উল্টোরথ' (১৩৫৩), 'পতাকা' (১৩৫৪), 'চড়াই-উৎরাই' (১৩৫৬), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৩৫৯), 'কাঠগোলাপ' (১৩৬০), 'অসবর্ণা' (১৩৬১), 'ধূপকাঠি' (১৩৬১), 'মলাটের রঙ' (১৩৬২), 'রূপালিরেখা' (১৩৬৩), 'দীপান্বিতা' (১৩৬৩), 'ওপাশের দরজা' (১৩৬৩), 'একূল ওকূল' (১৩৬৩), 'বসন্ত পঞ্চম' (১৩৬৪), 'মিশ্ররাগ' (১৩৬৪), 'উত্তরণ' (১৩৬৫), 'পূর্বতনী' (১৩৬৫), 'অঙ্গীকার' (১৩৬৬), 'দেবযানী' (১৩৬৬), 'রূপসজ্জা' (১৩৬৬), 'সভাপর্ব' (১৩৬৭), 'স্বরসন্ধি' (১৩৬৭), 'ময়ূরী' (১৩৬৮), 'বিদ্যুৎলতা' (১৩৬৮), 'পত্রবিলাস' (১৩৬৮), 'মিসেস গ্রীণ' (১৩৬৮), 'বিন্দু বিন্দু' (১৩৬৮), 'একটি ফুলকে ঘিরে' (১৩৬৯), 'বিনি সুতোর মালা', (১৩৬৯), 'রূপলাগি' (১৩৭০), 'চিলেকোঠা' (১৩৭১), 'অন্য নয়ণ' (১৩৭২), 'বিবাহ বাসর' (১৩৭৩), 'চন্দ্রমল্লিকা' (১৩৭৪), 'সন্ধ্যারাগ' (১৩৭৫), 'সেই পথটুকু' (১৩৭৬), 'অনাগত' (১৩৭৯), 'পালঙ্ক' (১৩৮২) ও উদ্যোগ পর্ব।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনের বিশেষ একটা পর্ব কেটেছে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় কোন পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় চাকরি করার নানা অভিজ্ঞতা। আজীবন শান্ত লাজুক নরেন্দ্রনাথ শিক্ষা-সঙ্গীত এবং ঈশ্বরের সাধন ভজনের পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। তাই হয়তো জীবনের শান্ত-সংযত মধুর জীবনের দিকগুলোই

তাঁর রচনায় বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। নিত্যকার জীবনে অনেক তুচ্ছ ঘটনার সমাবেশ ঘটে, তাকে কেন্দ্র করে যে গল্পের সূচনা, অনায়াসেই তা পরিণতিতে পৌঁছে যায়। আর সেখানেই আসল রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়, শেষ মুহূর্তের আকস্মিকতায় নতুন এক আলোর প্রকাশ ঘটে যায় তাঁর রচনায় — এটাই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের বিশেষত্ব। যেমন — 'রস', 'সেতার', 'চোর', 'মহাশ্বেতা', 'হেডমাস্টার', 'একপো দুধ', 'সিঁড়ি', 'সত্যাসত্য', 'চড়াই-উৎরাই', 'দাম্পত্য', 'হেডমিস্ট্রেস', 'রসাভাস' প্রভৃতি বহু গল্পে তিনি চমৎকারিত্বের নিদর্শন রেখেছেন। কল্পলোককে নয়, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে তিনি গল্পের পটভূমি করতে ভালোবাসেন বলে 'রস' গল্পে তিনি তাঁর পল্লীগ্রামের চিত্রকেই তুলে ধরেছেন। পূর্ববঙ্গের গ্রামের বাড়িতে খেজুর গাছ কাটা এবং তা থেকে নির্গত রস দিয়ে গুড় তৈরি করা — এই প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জীবনের প্রেম জটিলতা ও দ্বন্দ্ব বিকশিত হয়ে উঠেছে 'রস' গল্পে। গল্পের নায়ক মোতালেফের হৃদয় কন্দরে যে জটিল দ্বন্দ্ব ফুলবানু এবং মাজু খাতুনকে নিয়ে, তাই হচ্ছে গল্পের মূল উপজীব্য। রূপের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ, আর জীবনের কঠিন কাজ যে জীবিকার্জন — উভয়ের সংঘাতে মোতালেফের চরিত্রের দ্বন্দ্বের মূল দিকটি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। এখানেই লেখকের গল্প রচনার অনবদ্যতা। লেখক গোষ্ঠী যখন সমাজ এবং সমাজ অভ্যন্তরস্থ মানুষদের নিয়ে ভাবছে তখন নরেন্দ্রনাথ তাদেরই কথা বলছেন যেখানে সমাজ জিজ্ঞাসা নয়, ব্যক্তিমনের বিশ্লেষণ, দ্বন্দ্ব এবং হৃদয় রহস্যের উদ্‌ঘাটনই বড় হয়ে দেখা দেয়। 'রস' গল্পের চরিত্র মুসলিম সমাজভুক্ত হলেও মূল বক্তব্যে কিন্তু এটি সার্বিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। গল্পটি পড়ে পাঠক প্রেম, প্রয়োজন এবং জৈবিক তাগিদের যে সংমিশ্রণ পান, আর তা থেকে যে মানবিক জীবনরসের আবেদন ফুটে ওঠে — তার মধ্যে এক চিরকালীন সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র মনের অলিন্দে অলিন্দে বিচরণ করতে ভালোবাসতেন। তাই মানসিক উত্তরণ, বিবেকের জাগরণ, মানসিক পরিবর্তন এবং মনের অবচেতনে অবস্থান করা আবেগকে তিনি সুন্দরভাবে বিকশিত করতে পেরেছেন নানা গল্পে। 'রসাভাস' গল্পের পটভূমিতে দেখা যায় পঞ্চাশের ভয়াবহ আকালের দিনগুলি। মানুষের বোধবুদ্ধিতে যে সুকুমার বৃত্তিগুলো অবস্থান করে সেগুলো বিনষ্ট হয়ে যায় জীবিকার তাগিদে।

'চোর' গল্পের নায়ক অমূল্য চুরি-চামারি করেই জীবিকা নির্বাহ করে এবং হাত-সাফাই করে স্ত্রীকে প্রেমের উপহারগুলো দেয়। স্বামীর এই বৃত্তি রেণু অপছন্দ করলেও একদিন সে ওপরতলার বিনোদবাবুর হাতঘড়ি চুরি করে। সেদিন যেন অমূল্য কোথায় নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে পড়ল। স্ত্রীর সমস্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য্য তার কাছে লোপ পেয়ে গেল, অথচ সে এমনটিই মনে মনে চেয়েছিল। কিন্তু অমূল্যর মানসিক পরিবর্তন ঘটে যায়। স্ত্রী রেণুকে নিজ কু-বৃত্তির মধ্যে চাইলেও অবচেতন মনে স্ত্রীর প্রতি তার শ্রদ্ধাই ছিল এবং সেটাকে অবলম্বন করেই মনের সংগোপনে অমূল্য শক্তি সঞ্চয় করত।

মানসিক পরিবর্তনের আর একটি গল্প হচ্ছে 'মহাশ্বেতা' ও 'দাম্পত্য'। 'মহাশ্বেতা' গল্পের নায়ক চিন্মোহন বিধবা, শুভ্রবাস পরিহিতা মহাশ্বেতাকে ভালোবাসেন। প্রেমকে সুস্থ এবং সুন্দর পরিণতি দিতে তিনি তাকে বিবাহও করেন। কিন্তু বাসর ঘরে যখন বিয়ের কনে নববধূরূপে স্বামীর সম্মুখে এলেন তখনই চিন্মোহনের নিকট প্রেমিকাকে একটি সঙ বলে মনে হতে লাগল। 'দাম্পত্য' গল্পে বীরেন এবং রমা নামে এক দম্পতি রয়েছে। যারা নিত্য কলহে মত্ত থাকত এবং তাদের দারিদ্র্য ক্লিষ্ট জীবনে একাধিক কন্যা সন্তান রয়েছে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর যখন রমার একটি পুত্র সন্তান জন্মায়, তখনই স্বামীর স্মৃতিতে প্রেমে ভালোবাসায় নয়ন প্লাবিত করে গণ্ডদেশ বেয়ে অবাধে অশ্রুধারা নেমে আসতে থাকে। পুত্র সন্তানের মুখ দেখেই রমার মনে স্বামীর জন্য যে অনুরাগের জন্ম হল তা পূর্ব চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত, এভাবেই রমার মানসিক পরিবর্তন ঘটে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র সমাজনীতি-রাজনীতির মূল্যবোধে জীবনকে না দেখে শুধুমাত্র মানুষটিকেই বারংবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেন। সেখানে ধরা পড়ত ব্যক্তির অন্তর্গহনের জটিলতা। সে ধরনেরই একটি গল্প হচ্ছে 'সেতার'। নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবনসংগ্রাম এভাবেই যে মাঝে মাঝে মুখ থুবড়ে পড়ে সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন।

'চড়াই-উৎরাই' গল্পটিতে রয়েছে সমাজের শ্রেণিবিভাজনরীতি। গল্পটি উত্তম পুরুষে রচিত। গল্পের কথক কল্যাণ পূর্বের কথামতো এক বিত্তবান বন্ধুর বিয়েতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়। পেশায় লেখক কল্যাণ স্বরচিত বই ও ফুল নিয়ে গেলে বন্ধুর দ্বারা যথেষ্ট আপ্যায়িত হলেও তার বাবার কাছ থেকে বড়লোকের দম্ভপূর্ণ ব্যবহার বিভাজনের দিকটি সূচিত করে।

'এক পো দুধ' গল্পে আবার দেখা যায় নিম্নবিত্ত সংসারের সংগ্রামের মধ্যেও মানুষ মুমূর্ষু মানবতাকে কিভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছে। একমুখী ভাবনার উজ্জ্বল প্রকাশ এই গল্পটিতে দেখা যায়। অত্যন্ত সাধারণ একটি পরিবারের সঙ্গে তার চেয়েও দরিদ্র ফটিককে সংযুক্ত করে মানুষে-মানুষে, জীবনে-জীবনে যে সুগভীর সখ্যতা তৈরি হল সেখানে রয়েছে মানবতাবোধের উষ্ণতা। যা এই স্বার্থমগ্ন সমাজজীবনে মানবতার এক জীবন্ত দলিল।

'জামা' গল্পে আবার সামাজিক সেই ব্যবধানকেই টেনে এনেছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্য ও নিম্নবিত্ত এবং গরীব সমস্ত ধরনের মানুষের অন্তর্সংঘাতকে তুলে ধরতে চেয়েছেন কিন্তু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক নয় সম্পূর্ণ মনোলোকের প্রেক্ষাপটে। তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের স্থির শান্ত জীবনের অভ্যন্তর থেকে রহস্যের উন্মোচন করেছেন। বেশি সংখ্যক গল্পকে তিনি পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। কারণ সমাজের দেশের উত্তাল তরঙ্গ তাকে তরঙ্গায়িত করতে পারে নি, বরং তিনি মানবতীর্থের মহাসমুদ্রের তীরে নিরাপদ দূরত্বে বসে প্রায় প্রত্যক্ষ করা চরিত্রদের সঙ্গে নিজে গল্প কথার জাল বুনে গেছেন। সে কারণেই চিন্তনে-মননে-দর্শনে এক স্নিগ্ধ মাধুর্য্য বিস্তার

করে রয়েছে যা নাকি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-ঘৃণা-দর্প সবকিছুর উর্দ্ধে। গল্পের অন্তিমে তাঁর রচনায় সহসা যেন নবদিগন্তের উন্মোচন ঘটত। যেখানে মেলবন্ধন ঘটত গল্পের সমাপ্তি আর অপ্রকাশিত কথাটির নতুন অর্থের। আর এখানেই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্বতন্ত্রতা। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই স্থানেই যেখানে নরেন্দ্রনাথ বেশি করে মানুষের কথা বলেছেন, সেখানে আশাপূর্ণা দেবী বেশি করে নারীদের কথা বলেছেন। আর সেসব নারীরা শান্ত-শিষ্ট হয়ে শুধু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘাত করে নি, প্রয়োজনে ব্যক্তি ছাড়িয়ে সমাজের অন্যায়-বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্যকে জানিয়ে প্রতিবাদও করেছে, যা কিনা নরেন্দ্রনাথ মিত্র পুরুষ লেখক হয়েও করে ওঠেন নি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনায় তুলনামূলকভাবে শেষের দিকের চেয়ে প্রথম ও মধ্য পর্বের গল্পগুলো যথেষ্ট গভীরতা ও পরিণতির দাবী রাখে, কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী যত লিখেছেন তাঁর গল্প তত বেশি পরিণত হয়ে উঠেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (জন্ম - ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি, মৃত্যু - ১৯৭০ সালের ৮ই নভেম্বর) বাংলা ছোটগল্পের জগতে একটি উজ্জ্বল নাম। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে ধরনের গল্পগুলো লিখেছেন সেগুলোর পটভূমি অধিকাংশই বাংলার পল্লীগ্রাম, অবারিত মাঠ, দিগন্ত বিস্তৃত বনানী, সবুজ ও সোনালী ধানের ক্ষেত, উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের সুগভীর অরণ্যানী। এছাড়াও তিনি রোমান্টিকতাকেও কোন কোন গল্পে নিয়ে এসেছেন, আবার ইতিহাসের পাতায় অতীত যেখানে চিত্রিত হয়ে আছে তাকেও তুলে এনেছেন কোন গল্পে। তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হয় কবিতা রচনার মধ্য দিয়েই। প্রথমে তিনি লেখেন 'মাসপয়লা' পত্রিকায় এবং পরে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। তাঁর প্রথম লেখা গল্পের নাম 'পাশাপাশি' কিন্তু প্রথম মুদ্রিত গল্পের নাম 'নিশীথের মায়া'। প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম 'বীতংস'। তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলো হল — 'রূপমতী' (১৯৫৯), 'কালাবদর' (১৩৫৫), 'গন্ধরাজ' (১৯৫৭), 'ভাঙাবন্দর' (১৩৫২), 'গল্প সংগ্রহ' (১৯৫৭), শ্রেষ্ঠগল্প (১৩৫৬), চারমূর্তি (১৯৫৭), দুঃশাসন, শ্বেতকমল (১৩৬১), বীতংস, একজিবিশন (১৯৬২), উর্বশী (১৩৬৩), শিলাবতী (১৯৬৪), ভাটিয়ালী (১৩৬৪), জন্মান্তর, বনজ্যোৎস্না, ভোগবতী, শুভক্ষণ (১৩৬৭) প্রভৃতি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পটভূমির যে পরিবেশ রচনা করতেন তার বর্ণনা থাকত কাব্যিক ঢঙে আর গল্পের বর্ণনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোমাঞ্চ আর রোমান্টিকতা মিলে মিশে একাকার হয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতির জগত তৈরি করত। সমাজ চেতনা ছিল তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে, তাই প্রত্যেক মানুষকে তিনি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করতেন। এভাবে ব্যক্তিগত চেতনা থেকে ধীরে ধীরে এক সামগ্রিক বোধ তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়। আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনে কালচেতনাও প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। স্বদেশ প্রেম, দেশের বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভ ও সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার অধিকার ফিরে পাওয়া নিয়েও তিনি রচনা করেছেন।অর্থাৎ এককথায় বলা যায় তিনি স্বচক্ষে যা ঘটতে দেখেছেন সমাজের বুকে সে সমস্ত আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলোই তাঁর

রচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ও মৃত্যুর করালগ্রাস নিয়ে চল্লিশের দশকের যে মন্বন্তর বাংলার গ্রামের পর গ্রামগুলো শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছিল সে সময়ের চিত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কিছু গল্পের বিষয়বস্তু করেছিলেন। যেমন — 'হাড়', 'দুঃশাসন', 'নক্রচরিত', 'পুস্করা', 'ভাঙা চশমা' প্রভৃতি গল্পে। ১৯৪২-৪৫ এর সময়ের কালোবাজারি, অন্নহীনতা, অন্নের লোভে গ্রামের মানুষদের শহরের বুকে ছুটে আসা, একটু ফ্যান ভিক্ষা করা, কুকুরদের সঙ্গে খাবার নিয়ে অংশভাগ করার মতো দৃশ্যগুলো তিনি তাঁর রচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তরাই ও ডুয়ার্সের পরিবেশ, জলা জঙ্গল খুব পছন্দ করতেন এবং সেখানকার মানুষদের মধ্যেও তিনি এক অদ্ভুত বোধ খুঁজে পেতেন। সেই সঙ্গে তিনি তার ভয়ানক রসপ্রীতি ও বীভৎসতা বোধকে কাজে লাগিয়ে সেসব ভয়াবহ গল্পগুলো রচনা করেছিলেন যেগুলো পাঠের ক্ষেত্রে পাঠক ভয়াবহ এক হিংস্র কুটিলতা মিশ্রিত সত্যের সন্ধান পায় এবং শিহরিত, রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। 'বীতংস', 'জান্তব', 'টোপ', 'বনজ্যোৎস্না', 'বনতুলসী', উস্তাদ মেহেরা খাঁ' প্রভৃতি গল্পে এই রসের প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত গল্পে আবার কবি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কেও খুঁজে পাওয়া যায়, যিনি কোমল অনুভূতি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের মধ্য দিয়ে রোমান্টিকতার অনুলেপন দিয়েছেন বীভৎস রসের গভীরে ঠিক যেন ফল্গু ধারার মত। লেখকের অন্যতম 'বীতংস'র নায়ক হল দালাল সুন্দরলাল, যে আসামের চা বাগানের জন্য কুলি সংগ্রহ করে। লেখক তাঁর ছোটগল্পে যত ভয়ানক পরিবেশই সৃষ্টি করতে চান না কেন, তাঁর মূল যে তিনটি বৈশিষ্ট্য কৌতুক, কাব্যচেতনা ও রোমান্টিকতা তাকে কোন না কোনভাবে বজায় রাখতেন।

এই রোমান্টিকতা ও কবিত্বের বিকাশ ঘটেছে 'বনতুলসী', 'বনজ্যোৎস্না', ও 'উস্তাদ মেহের খাঁ' গল্পগুলোতে। ডুয়ার্সের পরিবেশের বর্ণনা ও প্রকৃতি প্রেম যেন তাঁর মজ্জার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতির অঙ্কে লালিত পালিত হয়ে ওঠা মানুষগুলোও যেন প্রকৃতির মতো সহজ-সরল প্রাণসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল — যা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে সর্বাধিক আকর্ষণ করত। তাই 'বনতুলসী'র বনবালিকা এবং শিউকুমারী গহন অরণ্যানীর জ্যোৎস্না পরিবেশে যেন জীবন্ত প্রকৃতি — দুহিতায় পরিণত হয়েছে। ধীরে ধীরে গল্পে পরিবেশের সঙ্গে সাজুয্য রেখে এক অদ্ভুত রস সৃজিত হয়েছে। 'উস্তাদ মেহের খাঁ' গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে তৈরি হয়েছে বীভৎস রস। মানবপ্রেমী উস্তাদজী আজীবন সুর সাধনা করে গিয়েছেন মানুষের জন্য। কিন্তু দাঙ্গা বিধ্বস্ত কোলকাতায় কিছু উগ্র মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের হাতে মানব প্রেমী ওস্তাদজীর মৃত্যু ঘটে, ফলে শেষ পর্যায়ে করুণ মূর্চ্ছনাই গল্পের প্রধান রস হয়ে উঠেছিল।

'টোপ' গল্পেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তরাই অঞ্চলের প্রকৃতির কোলে অদ্ভুত এক মোহময়

পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মূল গল্পটি থেকে যে রস উদ্ভুত হয়েছে তা হচ্ছে বীভৎস রস। বাঘ শিকারের জন্য মানব শিশুকে 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রাজাবাহাদুরের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিকতার বীভৎস রকমের অমানবিক দিকটি দেখিয়েছেন। আবার রাজকীয় বিলাসিতার সার্থকতার জন্য একটি চরম অবমূল্যায়নও দেখিয়েছেন। সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন অত্যাচারী রাজাবাহাদুরের প্রতি লেখকের নিক্ষিপ্ত উক্তি 'জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউটের বাচ্চা' — বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের প্রতি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের হয়ে লেখকের মূর্ত প্রতিবাদ।

মানব মনের বিচিত্র জটিলতাকে রূপায়িত হতে দেখা যায় 'দুর্ঘটনা', 'লালঘোড়া', 'ভাঙাবন্দর', 'ফলশ্রুতি', 'তিনজন' প্রভৃতি গল্পে। সমাজে বসবাসকারী মানুষের মানসকিতার নানা প্রতিফলনের বৈচিত্র্যই তো সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করে। যেমন 'দুর্ঘটনা' গল্পে মুখ পুড়ে যাওয়া শিক্ষিকা মিস্ ইন্দিরা চৌধুরী নিজের বিড়ম্বিত ভাগ্যের এবং বঞ্চিত জীবনের অপ্রাপ্তির স্বাদ মেটানোকে ভিত্তি করে এবং সময় অতিবাহিত করাকে গৌণ উদ্দেশ্য করে এক অবিশ্বাস্য গল্প রচনা করেন। মানবতাবাদের পূজারী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'রেকর্ড' গল্পে অচেনা এক সুরের অন্তরালে যে মূল সত্যটি উপস্থিত করতে চেয়েছেন তা হল সর্বহারাদের মধ্যেকার বিপ্লব চেতনা। দেশে দেশান্তরে কালে কালান্তরে সমস্ত বিপ্লবী মানুষের কণ্ঠে যে একই সুর নির্গত হয় তার উপলব্ধি ঘটানো। নানা অধিকারের দাবীতে শ্রমজীবী মানুষেরা, ছাত্ররা যে মিছিল করে তার ধ্বনি যেন একীভূত হয়ে একটা সুরে এসে লীন হয়েছে। গল্পের নায়কের আত্মবীক্ষণ ও আত্মানুভবের মধ্য দিয়ে বিশ্ববীক্ষা বোধগম্য হয়েছে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভাবালুতা বর্জিত যে নির্মোহ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় প্রায় সকল লেখকের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের একজন। দাম্পত্য জীবনে শুধু রোমান্টিকতাই নয় বাস্তবতা নির্ভরশীলতা নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তাও যে সত্যরূপে দেখা দেয় লেখক এটা 'কাণ্ডারী' গল্পে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। শুধুমাত্র আবেশ নয়, রোমান্টিক প্রেমের মুহূর্ত নয়, নিরাপত্তার সুদৃঢ়তার জন্যই লেখক নির্মমভাবে সত্যকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা পাঠকচিত্তকে সচকিত করে তোলে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'শিল্পীর স্বাধীনতা'য় বিশ্বাসী ছিলেন। আর তাই তাঁর আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতনতা ছিল প্রখর। তিনি রচনায় দেশ-কাল-সমাজ-প্রকৃতি-মানুষ প্রত্যেককেই প্লট হিসেবে রাখতে চেয়েছেন, এবং তাতে সার্থকতাও লাভ করেছেন। সংলাপ রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, চরিত্রগুলো যেমনভাবে যার বিকশিত হয়ে ওঠবার কথা, সে তেমনিভাবে প্রকৃতি পরিবেশ অনুযায়ী প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শব্দচয়নও অত্যন্ত সুচিন্তিত, সুনির্বাচিত এবং সমস্ত রসোপোযোগী। তাঁর ছোটগল্পগুলো আরম্ভ হত আকস্মিকতার আঘাতে আবার আকস্মিকভাবেই তা শেষ হত। কিন্তু যে জটিল রহস্যের জাল বিস্তৃত হত সমস্ত গল্প জুড়ে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন হত প্রায় শেষমুহূর্তে এসে, সেটাও সহসাই

হত। আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এখানেই মূল পার্থক্য যে, আশাপূর্ণা দেবী দেশ-কাল-সমাজ-প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে শুধু মানুষকেই প্লট হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মানুষের প্রসঙ্গে সমাজ চলে এসেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তিনি আঙ্গিক সচেতনতায় এতটা মনোযোগী ছিলেন না।

সাহিত্য সমাজকে নিয়ে এবং সমাজও একাধারে সাহিত্যকে নিয়ে পথ পরিক্রমা করে। তাই সমাজের বুকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো যেমন চল্লিশের দশকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা বিধ্বস্ত সমাজ, মন্বন্তর, দেশভাগ এবং এর ফলে প্রচুর উদ্বাস্তুর এদেশে চলে আসাকে কেন্দ্র করে সমাজে প্রচণ্ড অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। এর প্রভাবে সমাজের অভ্যন্তরস্থ পারিবারিক জীবন, এমনকি ব্যক্তি জীবনগুলোও প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। আর চলমান জীবনের এই অস্থিরতাটিকে মননঋদ্ধতার সঙ্গে আত্মবীক্ষণের দৃষ্টিতে ব্যঞ্জনাময় করে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষ সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। সমাজের সমস্যা নিয়ে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তা ব্যক্তিমনের মধ্যে গিয়ে কিভাবে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করল এবং রহস্যময় জটিল আবর্তে নিক্ষেপ করল তা সন্তোষ কুমার ঘোষের লেখনীতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিকায়িত হয়ে উঠেছে।

সন্তোষ কুমার ঘোষ (জন্ম ঃ ১৯২০ - মৃত্যু ঃ ১৯৮৫) নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত যে জীবনযাত্রা তাদের সার্বিক শূন্যতাবোধের অভ্যন্তরে যে জীবন তাকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে বিশ্লেষণ করেছেন। নিম্নবিত্তদের জীবন যন্ত্রণা, মানসিক বিধ্বস্ততা, দ্বন্দ্ব, ব্যথা বেদনার চড়াই-উৎরাই, অসহায়তাকে তাঁর ছোটগল্পে স্থান দিয়েছেন। তিনি প্রথম ছোটগল্পের জগতে 'শ্রেষ্ঠগল্প'-র (১৩৫১ বঙ্গাব্দ) পসরা সাজিয়ে নিয়ে উপস্থিত হন। পরবর্তীকালে — 'শুকসারী' (১৩৬০), 'পরমায়ু' (১৩৬৪), 'চীনের মাটি' (১৩৬৬), 'কড়ির ঝাঁপি' (১৩৬৬), 'চিররূপা' (১৩৬৬), 'কুসুমের মাস', মুখের রেখা' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থগুলো প্রকাশিত হয়েছে। তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তিতে যেখানে সমাজচেতনা, ব্যক্তিসত্তা বিশ্লিষ্ট হয়েছে সেসব গল্পগুলো হল — 'শোক', 'কানাকড়ি', 'যাদুঘর', 'শনি', 'কস্তুরীমৃগ', 'একমেব', 'শরিক', 'দ্বিধা', 'ঘর', 'মাটির পা', 'দুটি ঘর একটি নাটক', 'পুরনো রোগ', 'ধাত্রী', 'দিনপঞ্জী', 'জীয়ন কাঠি' প্রভৃতি।

সন্তোষ কুমার ঘোষের জীবনের মূলসুর হল আত্মজৈবনিকতা বা মৃত্যু চেতনায় আবৃত। তিনি মৃত্যুর মতো বড়ো সত্যকে তাঁর আত্মচেতনায় সর্বদা উপলব্ধি করতে চাইতেন, আর সেই বিষণ্ণতার ছাপ তাঁর ছোটগল্পে প্রতিকায়িত। 'শোক' গল্পে তারই প্রভাব চোখে পড়ে। সত্তর বছর বয়সী এক বৃদ্ধা তার মৃত স্বামীর বন্ধু সিতেশ ঠাকুরপোর মৃত্যুতে আজ শোকাকুলা। বৃদ্ধার সন্তানেরাও ভাবছে শোক। কিন্তু ভাবনাটি অনেকটা সত্য হলেও সর্বাংশে সত্য নয়। মানুষ বৃদ্ধ বয়সে একটি সমে ফিরতে চায় জীবনের মূলবিন্দুকে কেন্দ্র করে। তখনই স্মৃতির পাখায় ভর করে জন্মলগ্ন থেকে পরিভ্রমণ শুরু করে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব — সমস্ত আবর্তে পাক খেয়েই সমে ফিরে

আসে। এই বৃদ্ধাও তেমনি তার নিজের জীবনবৃত্তে পাক খাচ্ছিলেন — সিতেশ আর তিনি ছিলেন সমবয়সী, তাদের মানসিকতার একই স্তরে অবস্থানের ফলে অদ্ভুত এক সখ্যতাবোধ একটি সম্পর্কে উপনীত করেছে। মহাকালের বুকে তিনি প্রতিটি মানুষকে এক একটি পুতুল ভেবেছেন। জীবনের শুরু থেকেই মানুষ যে নিজেকে গড়তে শুরু করে, পাশাপাশি সে যেতে আরম্ভ করে এই বোধটা লেখককে খুব ভাবাত। ওপরে ওপরে যতটা প্রসারিত হয়ে শাখাপ্রশাখার বিস্তার ঘটায় ভেতরে ভেতরে ততটাই নিঃশেষ হয়ে সলতের তেল একদিন ফুরিয়ে আসে। সলতেটি তেলের সাহায্যে উজ্জ্বলাভা বিতরণ করতে করতে একদিন শূন্যতায় পর্যবসিত হয়, যা শব নামে পরিচিত। এই বোধই ছিল আত্মজৈবনিক সন্তোষ কুমার ঘোষের জীবনের মূলসুর।

মানুষের মন নিয়ে সন্তোষ কুমার ঘোষ অনেক পর্যালোচনা করেছেন। সমাজ, সংসার আধুনিকতার জটিলতার জালিকাবৃত্তে এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ে পড়ে মানুষের মন এখন সহজবোধ্যতাকে উত্তীর্ণ করে এক দুর্ভেদ্য দূর্গে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেন। বাস্তবের সঙ্গে সংঘর্ষ করে মানব প্রবৃত্তি অনেক কুটিলও হয়ে গিয়েছে। তারই নিদর্শন মেলে লেখকের 'মাটির পা' গল্পে। মাধুরী ও করবী দুই ভগ্নী। বড়জন বিধবা ও ছোটজন ধর্ষিতা। সমাজে দুজনেই চরম অবহেলার পাত্রী। কিন্তু এদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব দেখা দিল একসময় একজন পুরুষকে ঘিরে।

'ঘর' গল্পে দেখা যায় কৃষ্ণকুন্তলা আজীবন আড়কাঠির কাজ করে এসেছে। মনে মনে জলধরকে ভালোবেসে তার সঙ্গে জীবনের সুখ দুঃখ ভাগ করে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু এই চাওয়ার পথে অনেক বাধা থাকায় তা দূর করতে অনেক মেয়েকে সর্বনাশের অতলে নিয়ে গেছে।

'দ্বিধা' গল্পে দেখা যায়, ইঞ্জিনীয়ারের স্ত্রী করুণা — তার ওপর বলাৎকার করা হয়েছে। কোন রকমের কোন ঘৃণা, করুণা, সহানুভূতি সে চায় না, কোন ভয়ে সে ভীত নয়, তাই আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ায় আসামীকে শনাক্ত করতে। হাইকোর্টে যখন আরো ভালো বিচার পাবার আশায় আপিল করা হয় তখন আসামী পক্ষের উকিলের পারিশ্রমিক গোপনে করুণাই যোগান দিত। নারীচিত্তের এই দুটি রূপ সুন্দরভাবে সন্তোষ কুমার ঘোষ দেখিয়েছেন।

আধুনিক যুগে মানব মনের জটিলতাকেও লেখক যেমন দেখিয়েছেন তেমনি আবার প্রাচীনকালের চেয়ে আধুনিক মনের মানুষ অনেক বেশি মানবিক, সংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল এবং সহানুভূতিসম্পন্ন বলেও তিনি মনে করতেন। আধুনিক সমাজ সর্বদাই গতিশীল, ছকবদ্ধ জীবনধারা এখানে অচল। ঠিক তেমনি সন্তোষ কুমার ঘোষের গল্পও প্লট প্রধান নয়, গল্পের মূল বক্তব্যই মুখ্য স্থান লাভ করেছে। এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই একটা ছবি ফুটে ওঠে যার মধ্য দিয়ে লেখকের সূক্ষ্ম মননশীলতা প্রকাশ পায়। আর তাই ব্যক্তি চরিত্রের মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠা আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সংঘর্ষ ও জীবন যন্ত্রণা যুক্ত হয়ে যে অনুভূতি ব্যক্ত করে তাই লেখকের মূলমন্ত্র। তিনিও গল্পের সমাপ্তিকে সুন্দরভাবে

রূপায়িত করার জন্য উপযুক্ত চরিত্রের সৃষ্টি করেন। নিম্নবিত্ত সংসার তাঁর রচনায় বেশি থাকার ফলে দারিদ্র্য ক্লিষ্ট নারীদের চিত্র অঙ্কন করেছেন নিপুণভাবে। এককথায় বিষয়বস্তুতে তিনি মরমী মনের পরিচয় দিয়েছেন, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে রয়েছে অভিনবত্ব এবং ভাষাও সুনির্বাচিত, ঋজু, গতিশীল ও বুদ্ধিমত্তায় প্রখর। সমস্ত দিক থেকে সন্তোষ কুমার ঘোষ ছোটগল্পের অঙ্গনে একটি শাখাপ্রশাখা দ্বারা বিরাজিত সজীব কুসুমাকীর্ণ তরুবিশেষ। সন্তোষ কুমার ঘোষকে যেমন মৃত্যু চেতনা আবিষ্ট করে রাখত, আশাপূর্ণা দেবী আবার জীবনের কর্মমুখরতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আশাপূর্ণার রচনায় নিম্নবিত্ত সমাজের চেয়ে অবক্ষয়িত মধ্যবিত্ত সমাজ এবং জীবনযুদ্ধে যোদ্ধা নারীদের কথা বেশি বলা হয়েছে। এখানে সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর একটা বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বাংলা ছোটগল্পে গল্পের বদলে ছবি আঁকতে শুরু করেছিলেন আর একজন ধারা বদলের রূপকার, তিনি হলেন **বিমল কর** (জন্মঃ ১৯২১) তাঁর আবির্ভাবের পর ছোটগল্প আর একটি নতুন মাত্রা যেন পায়। বিমল করের বাল্যকাল ও কৈশোর বয়স কেটেছে ধানবাদ, আসানসোল, কুলটি কখনো কখনো ঝরিয়া ও হাজারিবাগ কয়লাখনি অঞ্চলের দিকে। ফলে তাঁর প্রথম দিককার লেখাগুলোতে ঐ সময়ের অভিজ্ঞতার কথাগুলো উঠে এসেছে। বিমল করের মধ্যে এক ধরনের মানসিক দোলাচলতা কাজ করত। তিনি যেসব ছোটগল্প রচনা করেছেন তাতে সাধারণত তাঁর মানসিক দোলাচলতার মতো গল্পের মূল উপজীব্যও দুধরনের দেখা যায়। যেমন — 'আঙুরলতা', 'আত্মজা', 'পার্করোডের সেই বাড়ি', 'মানব পুত্র', 'পলাশ', 'পিঙ্গলার প্রেম', 'উদ্ভিদ', 'যযাতি', 'শূন্য' প্রভৃতি গল্পে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিস্তার, সমাজের প্রভাব, মানুষের মানসিক পরিস্থিতির বিচিত্র হাল জটিলতার বিচার বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে। এসবের পাশাপাশি নতুন নতুন ভাষা ও আঙ্গিকেরও অভিনব ব্যবহারের প্রয়াস রেখেছেন। আবার তাঁর মধ্যে যে মানসিক অস্থিরতা, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলতা, মানুষের জীবনে ভাগ্যের প্রভাব মৃত্যুচেতনাকে ঘিরে বিষাদময়তা — সমস্ত মিলেমিশে অন্য ধরনের আর এ বিমল করকে পাওয়া যায় — 'জননী', 'সুধাময়', 'সোপান', 'অপেক্ষা', 'নিষাদ', 'গগনের অসুখ', 'উদ্বেগ' প্রভৃতি গল্পে। এই ধরনের গল্পগুলো পাঠকদের গভীরভাবে গল্পগুলোকে অনুভব করতে শেখায়।

১৯৪৪ সালে 'অম্বিকানাথের মুক্তি' নামে প্রথম গল্প লেখেন, 'প্রবর্তক' পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সাল থেকে বিমল কর যখন কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন, তখন থেকেই তিনি গল্প রচনায় হাত দেন। 'পিয়ারীলাল বাঈ' এবং 'ভয়' নামে দুটি গল্প লিখেছিলেন এবং তাঁর বন্ধুদের 'দ্বন্দ্ব' নামে একটি পত্রিকা ছিল, তাতে প্রকাশিত হয়। এরপর লেখেন 'ইঁদুর', যা 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় স্থান পায়। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রথম গল্প 'বরফ সাহেবের মেয়ে'। 'দেশ' পত্রিকার শ্রী সাগরময় ঘোষের অনুরোধে ১৯৫২ সাল থেকে পুরো সাহিত্যজীবন তিনি এই

পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর পাশাপাশি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে লেখালেখি নিয়ে যুক্ত ছিলেন।

'নিষাদ' গল্পে বিমল কর প্রথমেই পাঠকদের ঘটনাটি সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন এই উক্তির মাধ্যমে — "You begin by killing a cat and you end by killing a man." "ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ ... কিংবা কাল ...।" *(পৃ. ১১৫, বিমল করের নির্বাচিত গল্প)*। "নাম ওর জলকু। বছর বারো বুঝি বয়েস। এখানকার দেহাতি ছেলেদের মতনই দেখতে। গাঢ় কালো রঙ। নরম সিমেন্টে কালি মেশানো কালচে রঙের একটি ছাঁচ যেন।" "ছেলেটা একেবারে জংলী। ... গায়ে জামা দেয় না, পায়ে জুতো নেই। আদুল গায়ে নোংরা একটা ইজের পরে সারাদিন ওই রেল লাইনের কাছে।" *(পৃ. ১১৫, ঐ)*।এই জলকুর প্রিয় একটি ছাগল ছানা ছিল, যে নাকি রেল লাইনে কাটা পড়ে মারা গেছে। সেই আক্রোশে, দুঃখে, শোকে ছেলেটি রেল লাইনের ধারে বসে বসে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করতে ঢিল ছুঁড়েই যাচ্ছে। গল্পের আরম্ভেই লেখক যে অমোঘ নিয়তির কথা জানিয়ে দিলেন পাঠকদের গল্পের সঙ্গে সঙ্গে তাই যেন ফলপ্রসু হতে শুরু করে। চিত্র অঙ্কনে, শব্দচয়নে ও ভাবের ব্যঞ্জনায় গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক গল্পে পর্যবসিত হয়েছে।

'আঙুরলতা' গল্প পাঠ করতে গিয়ে পাঠকদের চক্ষু স্থির হবার উপক্রম হয়, কারণ, হাঘরে বেশ্যাকে নিয়ে এমন চিত্র অঙ্কন সত্যই বিরল। বারাঙ্গনা আঙুরলতার জীবনের পরিণাম এবং তাদের সমস্যা, দুঃখ, দুর্ভোগ কিভাবে জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে তার জীবন্ত দলিল হচ্ছে এই গল্পটি।

'আত্মজা' গল্পটিও বিমল করের একটি বিখ্যাত গল্প। একজন পিতার নিজের কন্যা সন্তানের প্রতি স্নেহকে তার স্ত্রী ধীরে ধীরে কোন বিকৃত রূপ নিয়ে প্রকাশ করাতে চাইছে —এটাই মূল বক্তব্য। বিমল কর এই গল্পের মধ্যে যেন বলতে চেয়েছেন স্নেহ আর স্নেহ নয়, প্রেম আর প্রেম নয়, গল্পটার শেষে এক বিষাদময়তার আবেশ ছড়িয়ে রেখেছেন। তা যেন সত্য নয় অথচ কেমন সত্যের ইঙ্গিত কন্যার প্রতি পিতার স্নেহে অসুস্থা রুগ্ন মায়ের ঈর্ষা যেন মনের পরিচায়ক।

'জননী' গল্পে দেখা যায় পাঁচটি ভাইবোনে মায়ের সমাধি বেদীতে একত্রিত হয়ে বসে মাকে কি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা যায় তার পরিকল্পনা করছে। প্রত্যেকের অন্তরের আর্তির মধ্য দিয়ে সদ্যমৃতা মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাদের মনোভাব গল্পের মধ্যে এক শীতল বিষাদ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখল। চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে এখানে তাদের মানসিক জটিলতা ব্যক্তিগত অন্তর্সংঘাত, নানা দ্বন্দ্ব মিশ্রিত অনুভূতি ও প্রশ্নের মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রকাশ করেছে।

'সুধাময়' গল্পে লেখক মনে করেন, তিনি তাঁর জীবনে যা যা লিখেছেন, তা সত্ত্বেও যে সমস্ত কথা না বলা থেকে গেছে তার অধিকাংশই যেন এই গল্পে বলা হয়েছে। অর্থাৎ বিমল কর ধারা

বদলের একজন রূপকার বলে তরুণ প্রজন্মের লেখকদের যে ধারণা রয়েছে, তার নিদর্শন স্বরূপ হচ্ছে এই গল্পটি। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অস্পষ্টতা, ধর্মবোধ, ঈশ্বর চেতনা, শূন্যতাবোধ, বিচ্ছিন্ন মনোভাব — সমস্ত অনুভূতির মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন এখানে 'সুধাময়' চরিত্রের মধ্য দিয়ে। এছাড়া 'উপাখ্যান', 'গগনের অসুখ', 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পেও লেখকের মনের অস্পষ্টতা ও মৃত্যুভয় কাজ করেছিল। তিনি যৌবনের কয়েকটি বছর বাদ দিয়ে প্রায় সারাজীবনই মৃত্যুভয়ে অস্বাভাবিক ভীত হয়ে থাকতেন বলেই হয়ত কোথাও কখনো শান্তি খুঁজে পাননি। এখানেই আশাপূর্ণার সঙ্গে বিমল করের স্বাতন্ত্র্য। আশাপূর্ণা দেবীর কথায় একমাত্র 'ভয়' গল্প ছাড়া মৃত্যুর কথা প্রায় নেই বললেই চলে। আর কোন চরিত্র যদিও বা মৃত্যুকে বেছে নিয়েছে, যেমন — তুষার মামী, সুশীলাবালা প্রভৃতি, তারা জীবনে আত্মসম্মানকে বজায় রাখতেই মরেছে, ভীত হয়ে নয়।

সমাজ সচেতনতার গভীর দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হলেন **সমরেশ বসু** (১৯২৪-১৯৮৮)। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির লোকজনদের জীবনযাত্রা, তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, তাদের মুখের ভাষাকে পর্যন্ত গল্পে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু এসবের চাইতেও তাঁর গল্পে বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে যৌবনমদিরতা। সমরেশ বসু জীবনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা ও চরিত্রের বৈচিত্র্যময়তাকে ছোটগল্পে নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, যা পাঠকদের অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করেছে। তাই প্রথম দিকেই তাঁর রচনার শক্তিমত্তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের পাঠক সমাজ সাগ্রহে সমরেশ বসুর লেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকত। শ্রমিক শ্রেণির মানুষের জীবনের দ্বন্দ্ব, টানাপোড়েন নিয়ে তিনি যে 'কিমলিস' গল্পটি লেখেন, তা তাঁকে অসম্ভব খ্যাতি এনে দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর লেখায় যৌবনাবেগের প্রাবল্য চলে আসে এবং সে সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনীতির কুটিলতা ও মস্তানদের আধিপত্য — সব মিলে মিশে কিমলিসের সমরেশ বসু অন্য এক জগতে যেন হারিয়ে গিয়েছেন। আর সব উপাদান সাহিত্যে যুক্ত হওয়াতে খ্যাতির বিড়ম্বনার পাশাপাশি বিতর্কের জালেও তিনি আবদ্ধ হয়েছেন। সমরেশ বসু রচিত উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হল — মরসুমের একদিন, ছেঁড়া তমসুক, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প (১ম ও ২য় খণ্ড), শ্রেষ্ঠ গল্প, ষষ্ঠ-ঋতু, অকালবৃষ্টি, রজকিনীর প্রেম, বনলতা, ছায়াচারিণী, যৌবন, পাপপুণ্য প্রভৃতি। তাঁর গল্পগুলোকে সাধারণতঃ দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটি পর্যায়ে রয়েছে সাধারণ অবহেলিত, অবজ্ঞাত গরীব মানুষের জীবনের কথা। অর্থাৎ যেখানে জীবনের সব বিপর্যয়ের শেষে জীবনের জয়ের কথাই ঘোষিত হয়। যেমন — কিমলিস, আদাব, প্রতিরোধ, ধুলিমুঠি কাপড়, পসারিণী, জলসা, তৃষ্ণা, আলোর বৃত্তে, অকাল বসন্ত, জোয়ার ভাঁটা, পাড়ি আর একটি মানুষ, সহযাত্রী, শেষ মেলায়, শানা বাউরীর কথকতা, প্রত্যাবর্তন, গুণিন প্রভৃতি এই ধরনের গল্প।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে যেসব গল্প যেখানে জীবনের নির্মম সত্যকে উদ্‌ঘাটনে আত্মসন্ধানী

মানুষ তৎপর। এই সৎ প্রচেষ্টায় প্রয়োজন হয় সাহসের আবিষ্কৃত হয় জীবন যন্ত্রণা — সমরেশ বসুর ছিল এই রহস্য উন্মোচনের মত জীবনদৃষ্টি। 'ক্রীতদাস', 'নটপুত্ত', 'মাঝখানে', 'পাপ-পুণ্য', 'স্বীকারোক্তি' প্রভৃতি হচ্ছে এই ধরনের গল্প।

'কিমলিস' গল্পে দেখা যায় শ্রমিক মালিকের চিরন্তন সংঘাত, যা সমাজের বুকে আজও জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে বিরাজিত। তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের বিদ্রোহের পটভূমিকায় লিখিত হয়েছে 'প্রতিরোধ' গল্পটি। দুটো গল্পেই শ্রমিক আর কৃষকদের ব্যথাতুর জীবনসংগ্রাম জীবন্ত দলিলরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

১৯৪৬ সালের 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পটি। এই বিখ্যাত গল্পটির মধ্যে লেখক দাঙ্গা বিধ্বস্ত ভয়াবহ পরিবেশের মধ্য দিয়েও কিভাবে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটেছিল তা দেখিয়েছেন। দাঙ্গায় চারদিকে যখন ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, হিন্দুর হাতে মুসলিম এবং মুসলিমের হাতে হিন্দুর নিধন যজ্ঞ চলছে সেই পরিবেশে 'আদাব' গল্পের পটভূমিকা তৈরি হয়েছে।

সমরেশ বসুর ছেলেবেলা কেটেছে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে। সেখানে তিনি যেভাবে বেড়ে উঠেছেন তাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ভূমিকা ছিল একটা আত্মীয়তার বন্ধনের মতো। ফলে 'আদাব' গল্পের হিন্দু চরিত্র হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের সুতা কলের শ্রমিক এবং মুসলমান চরিত্রটি বুড়িগঙ্গার এক নৌকোর মাঝি — এই চরিত্র দুটো আঁকতে গিয়ে কোন পক্ষপাতিত্ব তাঁর মধ্যে দেখা যায় নি। এদের কোন নামের বাঁধনেও লেখক বাঁধতে চাননি। তিনি চেয়েছেন এরা সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ঊর্দ্ধে উঠে যাক্ এবং তাই হয়েছে। এদের মুখ দিয়ে মানবতার কথা, মনুষ্যত্ববোধের জাগরণের জয়গান করিয়েছেন। ধর্মান্ধতার বিষময় পরিণতির কথা বলে লেখক জনগণের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে চেয়েছেন। দাঙ্গা বিধ্বস্ত পরিবেশ তৈরির ফলে যে একটা করুণ মর্মান্তিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এই গল্পে রচনার মধ্য দিয়ে পাঠকদের এ বিষয়ে সচেতন করে লেখক সমরেশ বসু সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন এবং দুটি মূল চরিত্রের মানসিক উত্তরণের মধ্য দিয়ে গল্পটিকে একটি সার্থক শিল্পে পরিণত করেছেন।

সমরেশ বসু চল্লিশের দশকের প্রায় পুরোটাই রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখেছিলেন। সেখানে তিনি রাজনীতির আদর্শ এবং তা থেকে ভ্রষ্ট হওয়া সমস্তই পর্যবেক্ষণ করেছেন। রাজনীতির ছায়ায় যেসব গল্প রচিত হয়েছে তা হল — স্বীকারোক্তি, সিদ্ধান্ত, বিবেক, মানুষ, প্রত্যক্ষ, পাতিহাঁস, অমনোনীত, সাফল্য যার যেমন প্রভৃতি। 'স্বীকারোক্তি' গল্পে রয়েছে রাজনীতির আদর্শ এবং আদর্শহীনতার লড়াই।

বামফ্রন্ট সরকারের একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বস্ত সূত্রে পাঁচ

লক্ষ টাকা অনুদান নিয়ে সে টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে সুদের টাকায় জীবন যাপন করার মতো অন্যায় দেখানো হয়েছে 'সাফল্য যার যেমন' গল্পে। আদর্শবান মানুষও রাজনীতির অবক্ষয়ের আবর্তে পড়ে কিভাবে চক্রান্তের শিকার হন এবং দালালে পর্যবসিত হন তা দেখা যায় 'প্রত্যক্ষ' গল্পে। 'শহীদের মা' গল্পেও দেখা যায় ঘৃণ্য রাজনীতি।

সমরেশ বসু রাজনীতিকে কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝেছেন সেখানে রয়েছে সংগ্রাম, প্রতিবাদ, আদর্শ আবার তার পাশাপাশি আদর্শ ভ্রষ্টতা, হিংসা, খুন। তাই তাঁর রচনাতে রাজনীতিও একটা বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। ১৯৪৬-৭০ — এই পঁচিশ বছরে সমরেশ বসু প্রায় দুইশতর বেশি গল্প লিখেছেন। সেখানে তাঁর জীবনের নানা বৈচিত্রপূর্ণ অভিজ্ঞতা, জীবনবেদ, মানবিকতা সহানুভূতিকে এমনভাবে শিল্পীত করে তুলেছেন যে পাঠকরা তার চরিত্রগুলোর সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে যান এবং সমাজ, রাজনীতির ছবিগুলো চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করে থাকেন। অর্থাৎ সমরেশ বসু একজন সার্থক শিল্পী হয়ে উঠেছেন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। আশাপূর্ণা দেবী আর সমরেশ বসুর মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। সমরেশ বসুর প্রিয় রাজনৈতিক জগত সম্পর্কে আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন ভীষণভাবে উৎসাহহীন। যে যৌবনমদিরতা সমরেশ বসুর রচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল আশাপূর্ণা দেবীর রচনায় সেই যৌবন মধুর প্রেমে অবগুণ্ঠিতা ছিল। দুজনের লেখার জগৎ ছিল একেবারে স্বতন্ত্র, সমরেশ বসু অন্তঃপুরের চারদেওয়ালে আবদ্ধ জীবনগুলোর প্রতি আশাপূর্ণার মতো দৃক্‌পাত করেন নি।

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬ সাল) বাংলা সাহিত্য জগতে প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক রূপে প্রতিভাত। তিনি নিজে বিখ্যাত কম্যুনিস্ট বাড়ির মেয়ে ছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি দক্ষিণ কোলকাতার কিশোর বাহিনীতে এসে যোগ দেন এবং ১৯৪৪ সালে তাঁর পিতার চাকরিতে বদলির সূত্রে রংপুর চলে যান এবং পার্টির কাজে নিযুক্ত হয়ে যান। ১৯৬৩ সালে প্রাইভেটে এম. এ. পাশ করেন এবং ১৯৬৪ সালেই বিজয়গড় কলেজে অধ্যাপনার চাকরি পেয়ে যান। ১৯৮২-৮৪ সাল, দু'বছর সাংবাদিকতার কাজেও নিযুক্ত ছিলেন এবং ৮৪ তেই চাকরিও ছেড়ে দেন। সাহিত্যচর্চায় তখন থেকে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেন। ষাটের দশক থেকে তাঁর চিন্তাজগৎকে আলোড়িত করতে থাকে আদিবাসীদের জীবন যন্ত্রণা। ১৯৬৫ সালে পালামৌ বেড়াতে গিয়ে তিনি আদিবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হন, তাদের দুঃখ-দুর্দশাগুলো অনুভব করেন। এর ওপর ভিত্তি করেই লেখেন 'অরণ্যের অধিকার' যা ১৯৭৮ সালে 'বেতার জগৎ' এ প্রকাশিত হয়। এই রচনার ওপর 'আকাদেমি' পুরস্কারও পান ১৯৭৯ সালে। সেই থেকে তিনি আদিবাসীদের জনসমক্ষে তুলে ধরতে যেন ওদেরই একজন হয়ে গেলেন। ১৯৮০-৮১ সালে পুনরায় পালামৌ গিয়ে 'বন্ডেড লেবার' দের নিয়ে সংগঠন করলেন। ১৯৮৩ সালে 'ঘোড়িয়া ট্রাইব'দের নিয়ে এবং ঝাড়গ্রামে গিয়ে 'লোধা'দের নিয়ে তৈরি করলেন সংগঠন। ট্রাইব্যাল

এবং নন্-ট্রাইব্যালদের নিয়ে একটি পূর্ণ সংগঠন তৈরি করেন। আদিম জাতি ঐক্য পরিষদ নামে।

মহাশ্বেতা দেবী যে সমস্ত গল্প লিখেছেন সেগুলো হল — ভাতুয়া, বিচন, দ্রৌপদী, সাঁঝ সকালের মা, মানত, এজাহার, তীর ঃ ১৯৯ ঃ আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষে, সংরক্ষণ, বায়েন, মৃত্যুর কারণ, বান, হারুণ সালেমের মাসি, কুসুমা, পণ্য, লড়াই প্রভৃতি আরও অজস্র গল্প। সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষদের বিরুদ্ধে বিত্তবান মানুষের অত্যাচারের চিত্র বারংবার মহাশ্বেতা দেবী অত্যন্ত দরদ দিয়ে তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন। এই রকমই সুদখোর মহাজন কালীবাবু, তার বিরুদ্ধে নিপীড়ণের শেষ পর্যায়ে গিয়ে ভাতুয়া পবন প্রতিবাদ করে উঠেছে 'ভাতুয়া' গল্পে। দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মহাশ্বেতা দেবীর রচিত এই গল্পটি।

'সাঁঝ সকালের মা' (১৯৫৯ সাল) মহাশ্বেতা দেবীর এক অনবদ্য সৃষ্টি। পাখমারা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত জটিশ্বরী চরিত্রকে নিয়ে এই গল্প। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রক্তিম চরণকে পাখী ভেবে বাণ মেরে মৃত্যু ঘটিয়েছিল যে জরা নামক ব্যাধটি, এরা হলেন সেই জরা ব্যাধের বংশধর। সেই থেকে এরা সমাজচ্যুত, অন্য জাতির সঙ্গে এদের বিবাহ কার্য চলে না। সংস্কার, অভিশাপ দুই থেকেই মুক্ত করে জটিশ্বরীকে লেখিকা এক সাধারণ মানবী করে তোলেন, জটিশ্বরী জায়া, জননী ও মানবী হয়ে ওঠে।

পুরোহিত সমাজের লোভের নগ্ন চিত্রটাকেও মহাশ্বেতা দেবী এই গল্পে তুলে ধরেছেন। সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতার চাপে পড়ে নারীর যে করুণ দুর্দশা হয় সেটাও পরিলক্ষিত হয় স্বামীহারা জটিশ্বরীর সন্তান কোলে বারংবার আশ্রয়চ্যুতির ঘটনায় এবং শেষ পর্যায়ে জটি ঠাকুরাণী হবার মধ্য দিয়ে।

'বিছন' গল্পেও আদিবাসী হরিজন চাষীদের অত্যাচারিত হবার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। রাজপুত জোতদার ও মহাজনরা কিভাবে এই অসহায় আদিবাসীদের ওপর অত্যাচার চালাত, শোষণ করত তার জীবন্ত দলিল এই 'বিছন' গল্পটি।

'দ্রৌপদী', 'এজাহার', গল্পগুলোতে উঠে এসেছে নকশাল আন্দোলনের সময়কার কথা। এখানে প্রশাসনের দুষ্ট প্রভাবের ছাপও রয়েছে। সাঁওতালদের নেতৃত্বে যে নকশাল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে; সেই আন্দোলনকারীদের ওপর প্রশাসনের অমানবিক অত্যাচার আর অত্যাচারের প্রতিরোধ বর্ণিত হয়েছে এই 'দ্রৌপদী' গল্পে।

প্রশাসনের পাশবিক দিকের আরও একটি জ্বলন্ত ও নগ্ন চিত্র রূপায়িত হয়েছে 'এজাহার' গল্পে। একটি মুসলমান মেয়ে মুসাম্মিনকে গুণ্ডাবাহিনী এবং প্রশাসনিক বিভাগের কর্তারা মিলে যেভাবে অত্যাচার করে তার বিরুদ্ধে মুসাম্মিনের প্রতিবাদে গর্জে ওঠার কাহিনি হচ্ছে 'এজাহার'। মহাশ্বেতা দেবী সমাজের বুকে যেখানে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, অবিচার চলছে তার বিরুদ্ধে সর্বদাই গর্জে উঠেছেন। তাঁর রচনায় বিষয়ের সত্যতা, ভাষার বৈচিত্র্য, আঙ্গিক, প্রকরণ এবং সর্বোপরি মানুষের কথা এত নিপুণভাবে বলা হয়েছে যা গভীরভাবে মনে দাগ কাটে। মহাশ্বেতা দেবী

আজও এসব অসহায় মানুষের বুকে সাহসের সঞ্চার ঘটিয়ে চলেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী এবং আশাপূর্ণা দেবী দুজনেই লেখিকা হলেও দুজনেরই চিন্তা জগতের মূল ভিত্তি ভূমিটা একেবারেই পৃথক জগতের। মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন প্রথাগত শিক্ষায় সুশিক্ষিতা এবং বহির্জগতে প্রতিষ্ঠাতা। তাই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর যাতায়াত এবং তাঁর চরিত্রদের শরিক হওয়াতেই তিনি আনন্দ পেতেন, গৃহগত কোন সমস্যা তাকে ভাবিত করত না। অন্তঃপুরের নারীরা তাঁকে আন্দোলিত করে নি, বৃহত্তর জগতের আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন। আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত। বহির্জগত তাঁকে বিন্দুমাত্রও আলোড়িত করত না। ঘরে আবদ্ধ অন্তঃপুরিকাদের যে দুঃখ, ব্যথা ও তাদের মনোলোকের গতিবিধি তাই তাঁর কাছে ছিল প্রিয় এবং সেগুলিই তাঁর রচনায় প্রিয় বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে।

এই সময়ের অপর একজন সাহিত্যিক হচ্ছেন **নবেন্দু ঘোষ** (১৯১৭ সাল)। তিনি প্রগ্রেসিভ রাইটার্স এ্যাসোসিয়েশন এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমাজের প্রতি সচেতন হয়ে এবং দায়বদ্ধতাকে মেনে নিয়ে সমাজকে নতুন চেতনায়, স্বপ্নে ও নতুন জীবনের উজ্জীবন মন্ত্রে দীক্ষিত করতে লেখনী ধরেছিলেন। মানুষের জীবনের মধ্যে যে ব্যর্থতা, স্বার্থপরতা, কুটিলতা ও নিরাপত্তাহীনতা কাজ করে — এই দুর্বহ পরিস্থিতিকেই বদলে নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি করতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন লেখক নবেন্দু ঘোষ। দরিদ্র, শোষিত মানুষের অজ্ঞতা ও সরলতার সুযোগে ধনী মালিক শ্রেণির অত্যাচারের রকমফের তিনি তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। ধর্মের মধ্যে সাধারণ অসহায় মানুষ মুক্তির সন্ধান করলেও ধর্মের অভ্যন্তরেও পাপীদের জাল কিভাবে বিস্তৃত তাও তিনি দেখিয়েছেন। জন্তু-জানোয়ারের সমগোত্রীয় যে শোষিত মানুষ, তাদের প্রতি সমবেদনা ও ভালোবাসা থাকলেই যে সমাজে সাম্য বজায় থাকবে সেটাও নবেন্দু ঘোষ বলেছেন। আবার শুধু তিমিরাবৃত সমাজের কথাই তিনি বলেন নি, জীবন যে বৃহত্তর সৌন্দর্যবোধের দিকেও যেতে পারে, একথাও বলেছেন বারংবার। এই বোধগুলোই তাঁর রচনার মূল উপজীব্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। অত্যন্ত আন্তরিকভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সমাজের বৈষম্যকে তিনি ঘোচাতে চেয়েছিলেন। তিনি যে গল্পগ্রন্থগুলো রচনা করেছেন সেগুলো হল — 'এই সীমান্তে' (১৯৪৫), 'পোস্টমর্টেম' (১৯৪৬), 'ইস্পাত' (১৯৪৮), 'কান্না' (১৯৫০), 'সিঁড়ি' (১৯৫৭), 'পঞ্চম রাগ' (১৯৬০) প্রভৃতি। শ্যামরায়ের মৃত্যু, বাঁকা তলোয়ার, বস্ত্রংদেহী, ছিন্নমস্তা, কান্না, এই সীমান্তে, কল্কি প্রভৃতি অনেক গল্প।

যেমন 'শ্যামরায়ের মৃত্যু' গল্পে রয়েছে লক্ষ্মীপুরের পাটকলের অশিক্ষিত ধর্মভীরু মজুরদের শোষিত হবার চিত্র।

মালিক শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিয়ে দেখা দেয় 'কান্না' গল্পটিও। মালিকের অন্যায়ভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিক ভাইদের সঙ্গে ধর্মঘটে সামিল হয়েছে বিপিন। যার সংসার অত্যন্ত অনটনের মধ্যে

চলে, তথাপি ভবিষ্যতে নিজের দুর্দিনের কথা চিন্তা না কর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, কারখানায় ধর্মঘট করে শ্রমিকদের অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চেয়েছে।

'বাঁকা তলোয়ার' গল্পে দেখানো হয়েছে মধ্যবিত্ত জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা কিভাবে দাম্পত্য জীবনেও চরম ট্র্যাজেডি বহন করে আনে। গল্পের মূল নারী চরিত্র পার্বতী। দারিদ্রের কঠিন ছোবলের মধ্যেও সংসারের কৌলিন্য এবং নিজের সতীত্বকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছিলেন। কিন্তু সংসারকে বাঁচাবার শেষ আন্তরিক চেষ্টা হিসেবে যখন নিজের সতীত্বকে বিসর্জন দিলেন, তখনই নিজের স্বামী সন্তানকেও হারালেন। ভয়ানক কষ্টে, মনের তীব্র দহনে নিজেরই মুষ্টিবদ্ধ হাতটা যেন বাঁকা তলোয়ারের মতো চকচকে হয়ে ওঠে।

জীবনের সৌন্দর্যবোধ ও মুক্তি কামনাকে প্রেম-ভালোবাসার স্বপ্নে বিভোর করে তুলে নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় নবেন্দু ঘোষের কিছু গল্প। মুক্তির আনন্দকে উপভোগ করার জন্য এখান থেকে সেখানে ছুটে বেড়ায়। তাঁর সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা, অবহেলিত নির্যাতিত মানুষের জন্য সমবেদনা — সমস্ত কিছুর সম্মেলনে তিনি এক শক্তিশালী লেখক হয়ে উঠেছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে।

সাহিত্য রচনা যারা করেন, প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা বিশেষ অনুভূতি আছে যা তাদের মনন-চিন্তনকে আলোড়িত করে তোলে অনবরত। তাতেই প্রকাশ পায় লেখক বা লেখিকা কোন্ দিকটি নিয়ে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করতে চাইছেন। উপরিউক্ত লেখকদের সমকালীন লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর আলোচনার বিষয় ছিল সমাজের অন্তর্গত এক একটি পরিবার যারা সংসারে বিরাজিত, সেই সংসারের অভ্যন্তরের কথা। এই সাংসারিক মানুষগুলোর বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবার, যারা বেঁচে থাকার জন্য অনবরত সংগ্রাম করে যাচ্ছে তাদের সংঘাতপূর্ণ, দ্বন্দ্বময় জীবনালেখ্য রচনা করাই ছিল লেখিকার মূল লক্ষ্য। তাঁর অন্তরের চিন্তা-চেতনাকে আন্দোলিত করেছিল এ সমস্ত পরিবারের মেয়েদের নানা সমস্যাগুলো। সমাজ, সমাজ অভ্যন্তরস্থ সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম, যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি অর্থাৎ এককথায় নানাবিধ সামাজিক সমস্যাগুলো আশাপূর্ণা দেবীকে ভাবিত করত না।

তিনি ব্যক্তিজীবনে যে রীতিনীতিগুলো দেখেছেন, সেগুলোকে বৈষম্যমূলক রীতি বলে মনে হয়েছে বলেই তাঁর চিন্তাজগৎ সর্বদাই এই তরঙ্গের অভিঘাতে আলোড়িত হতে থাকত। এর ফলেই তিনি অনুভব করতে লাগলেন সমাজের একেবারে অভ্যন্তরে যে অবহেলা, অসহিষ্ণুতা, বিদ্রোহ পুঞ্জিভূত হয়ে আছে, নারীদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অত্যধিক অনুশাসনের ফলেই এর জন্ম হয়েছে। সংসারে নারী-পুরুষের সে সামাজিক বন্ধনগুলো রয়েছে তার যতটা সংস্কারজনিত অভ্যাস, ততটা হয়ত প্রেমের নয়। নারীরা যে ব্যক্তিসত্তার অধিকারিণী হতে পারে এই বোধটাই

তাদের মধ্যে জাগ্রত হতে দেয়নি সংসারের নিয়মকানুনের নিষ্ঠুর রীতিগুলো। এই যন্ত্রণাদায়ক কঠিন জীবনযাপন করতে গিয়ে নারীরা কিভাবে প্রতিবাদ করে উঠেছে, ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়ে ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে উঠেছেন এবং প্রয়োজনে পরিবারের কর্তৃত্বের প্রতি বিদ্রোহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন — এই দিকগুলোই আশাপূর্ণা দেবীর রচনার মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে। তাই বাস্তব ঘটনা সঞ্জাত তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু এবং চরিত্রগুলো, যা জীবনের বেদনাঘন অনুভূতির রসে সিক্ত হয়ে পাঠকের অন্তর্লোকে কম্পন তুলেছে।

সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তা আর এক লেখিকা হচ্ছেন নবনীতা দেবসেন। তিনি আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্ট নারী চরিত্রদের সম্পর্কে বলেছেন — "চারদেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে থাকলে কি হবে, জীবনের জটিল, রঙীন, রক্তাক্ত সংগ্রামে আশাপূর্ণার নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক প্রতিপত্তি, অর্থবল, লোকবল নিয়ে বহিরঙ্গে পূর্ণ ক্ষমতাশীল পুরুষের অন্তরঙ্গের বলে বলীয়ান না হলেও হয়ত চলে যায়। কিন্তু স্ত্রীলোকের মূল শক্তি যে অন্তর্নিহিত। আশাপূর্ণার নারীদের বোধবুদ্ধিই তাদের প্রকৃত স্ত্রীধন। তাঁর গল্পে প্রায়ই সাধারণ মেয়েদের মধ্যে অনন্য সাধারণ মনুষ্যত্ব ঝিলিক মারে।" ('আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন' এর ভূমিকা অংশে নবনীতা দেবসেনের লেখা থেকে গৃহীত)। অর্থাৎ আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে নারীরাই উজ্জ্বলতার সঙ্গে প্রতিভাত।

উপরিউক্ত লেখকদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেরই রচনার বৈশিষ্ট্যগুলো স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। যেমন — সুবোধ ঘোষের রচনায় সমাজের নানা ক্ষত তাঁর সাংবাদিক সত্তায় ও লেখকের দরদী মনে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনায় দেশ-কালের অস্থিরতা নয়, সমাজের উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্তদের অন্তসংর্ঘাতকে তুলে ধরেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে প্রকৃতি, দেশ, সমাজ, মানুষ সকলেই সমান আবেগে স্থান লাভ করেছে। পল্লী প্রকৃতি ও উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল, সেখানকার আদিমতা, বীভৎস রস তাঁর গল্পে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। সন্তোষকুমার ঘোষ দেশ এবং সমাজের সমস্যা যে ব্যক্তিমনেও অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে এবং তার প্রভাব মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সমাজেও যে পড়েছে তাকে রূপায়িত করেছেন। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের নিজের মৃত্যুচেতনা, যা বিষণ্ণতার ছায়া ফেলেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন শান্ত, নির্জনতাপ্রিয়, প্রকৃতি-প্রেমিক ও অন্তর্মগ্ন। অবক্ষয়িত সমাজের কথাও তাঁর রচনায় রয়েছে, কিন্তু সজীব দৃষ্টি দিয়ে তন্ময়ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে যে অন্তঃদর্শন তাঁর ঘটত তাই তাঁর লেখনীকে সচল রাখত। সমরেশ বসু তাঁর রচনায় সমাজ, রাজনীতি, সংগ্রাম, প্রতিবাদ এ সমস্তকে তো রেখেছেনই পাশাপাশি তাঁর রচনায় যৌবনাবেগও স্থান পেয়েছে। বিমল করের রচনায় প্রায় সর্বত্রই রয়েছে নিয়তির অমোঘ বিধানের কথা ও ব্যক্তি জীবনে মৃত্যুকে কাছে থেকে উপলব্ধি করার ফলে বিষণ্ণতার চেতনায় আবদ্ধ মৃত্যুচিন্তা। নবেন্দু ঘোষও সমাজের অত্যাচার অত্যাচারিতদের কথা এবং শোষণ, বঞ্চনা ও ধর্মান্ধতার

কথা তুলে ধরেছেন। আর মহাশ্বেতা দেবী তো আদিবাসী সমাজের অত্যন্ত সাধারণ মানের সহজ, সরল, অশিক্ষিত, চিরকালে নিপীড়িত মানুষের প্রাণের একেবারে কাছে চলে গিয়েছেন। শুধু তাই নয় তাদের ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করার জন্য লড়াই করছেন ও সর্বসমক্ষে সাহিত্যের মাধ্যমে তা তুলে ধরছেন। কিন্তু এঁদের সকলের চাইতে আশাপূর্ণা দেবীর স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে, তিনি যাদের কথা লিখে গেছেন তাদের কথা যে লেখা যায় তা কেউ কখনো ভাবনার জগতেই আনেন নি। অন্দরমহলের অত্যন্ত সাধারণ, শিক্ষা-দীক্ষা বর্জিত, আটপৌরে নারীদের মনের নানা অলিগলির যে অজস্র দিক, সেগুলো সুন্দরভাবে উঠে এসেছে আশাপূর্ণা দেবীর লেখনীতে। বাস্তব সংসার থেকে, মাটির ঘর থেকে যেসব আশা-হতাশা, বঞ্চনা, অবহেলা, প্রতিবাদ, বিদ্রোহ উঠে আসে তাকেই তিনি তুলে ধরেছেন ছোটগল্পগুলোতে। শুধু সমকালীন সাহিত্যিকেরা নন, বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো করে বোধহয় কোন সাহিত্যিকই এতটা ঘরোয়া, আটপৌরে উপাদান নিয়ে অসংখ্য রচনা করেননি। আমাদের চোখের সামনে অনবরত ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলোর বাহ্যিক চেহারাটাই যে সব নয়, না দেখার মধ্যেও যে অনেক কথা রয়ে গিয়েছে সেটা আশাপূর্ণা দেবী উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি নিজে চারদেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ জীবন কাটিয়েছেন বলে সে সব নারীদের মনের কথা তিনি আন্তরিকভাবে অনুভব করতে পারতেন। কিন্তু মনের যে দিকগুলো দেখা যায় না, শুধু একটু নজর রাখতে হয়, সেটা তিনি করতেন। অর্থাৎ এককথায় যে অজস্র রচনা রাশি তিনি বাংলা সাহিত্য জগতকে উপহার দিয়েছেন তার জন্য ঘরের বাইরে তাঁকে চোখ রাখতে হয় নি। সমাজের দেশের বৃহত্তর সমস্যায় চোখ রাখতে হয়নি। তিনি নিজেও অত্যন্ত সহজ-সরল, আটপৌরে একজন বাঙালী নারী ছিলেন, আর বাঙালী ঘরের সাধারণ চিত্রগুলোও সহজভাবে তাঁর রচনায় উঠে এসে তাঁকে করেছে একেবারে অসাধারণ, স্বাতন্ত্র্যময়ী এক অনন্য লেখিকা, যা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

বিশ শতকের প্রথম পাদে তখনও অতি নগণ্য সংখ্যায় নারী শিক্ষা জগতে এসেছেন এবং কেউ কেউ কর্মজগতে ঢুকে পড়েছেন, এরকম এক প্রেক্ষাপটে বাঙালি পরিবারের অন্দরমহল যে পরিবর্তনের ছোঁয়ায় সেভাবে আসেনি সেই অন্দরমহলে আবদ্ধ নারীর নানান দুঃখ-কষ্ট, বদ্ধতার যন্ত্রণা, রক্ষণশীল মনোভাবের শিকার হওয়া সেসব কথাই আন্তরিকতার সঙ্গে অনুভূতিপ্রবণ হয়ে লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন এবং তাদের স্বাতন্ত্র্যকেও চিহ্নিত করে প্রকাশ করেছেন।